Ebang Mushayera – Prabandho – Others – Jibananender Galpe Swamira : ‘Swami-Debota’ Na ‘Swami-Rakshash’ – Ballari Sen

এবং মুশায়েরা - জীবনানন্দের গল্পে স্বামীরা স্বামী-দেবতা না স্বামী-রাক্ষস’ - বল্লরী সেন

জীবনানন্দের গল্পে স্বামীরা হয় নিঃসন্তান, নয় এক কন্যার জনক। স্ত্রী মেয়েকে নিয়ে পৃথক শয্যায় রাত্রিযাপন করে। এতে স্ত্রীটির কোনো খেদ বা মানসিক অবদমনের চিহ্নমাত্র নেই, বরং উষ্ণ বিছানার আরামে ক্লান্তির ঘুম আছে। অন্যদিকে স্বামীটি ? সে গভীর রাত অবধি মশারির মধ্যে অপেক্ষা করে, কখনো সমস্ত রাত দরজা কিংবা জানলা খুলে শোয় - পাছে ডাক আসে; কিন্তু স্বামী - সান্নিধ্যে পরাঙমুখ মেয়েটির দিক থেকে কোনোই আহ্বান আসে না। তবু আজ নয় কাল ভেবে ছেলেটির অপেক্ষার প্রহর শেষ হয় না। জীবনানন্দের গল্পে স্বামীরা এইরকম স্ত্রৈণ নয়, অতিমাত্রায় সহনশীল। যেমন ‘বিবাহ অবিবাহ’ গল্পের শুরুতেই অমূল্য যখন সরযুর কাছে এক গেলাস জল চায়, সরযু বাড়ির চাকর হরিচরণকে কাজের ভার চাপিয়ে সরে পড়ে। সরযূর রাজ্যের কাজ। একান্নবর্তী পরিবারের মধ্যে তার বরের কাছে দু দণ্ড বসার বা গপ্পো করার মত সময় নেই। ‘মাল্যবান’ উপন্যাসের উৎপলাকে মনে পড়বে, যে স্বামীকে একতলার এঁদো কলঘরে বহুদিনের বাসি জল ব্যবহার করতে বাধ্য করে আর নিজের জন্য ওপরে চমৎকার থাকার ব্যবস্থা করে নেয়। স্বামী-সঙ্গ তার দরকার নেই। সারাদিনের হাড়-ভাঙা খাটুনির পর সে নাক ডেকে ঘুমোতে চায়। স্বামী ওপরে উঠে এলেও তার ঘুমের ব্যাঘাত ঘটে। তাই গুটি-গুটি পায়ে মাল্যবানকে ওপরে উঠে আসতে দেখে উৎপলা তার হৃদয়হীন স্বার্থপরতাকে অশ্রাব্য ভাষায় উদগার করে দেয়। স্বামী তাতে অপমানিত বোধ করে না। সম্পর্ক ছিন্নও করে না। পুরুষের কর্তৃত্ব ফলাতেও দেখি না আমরা। উৎপলা যে ‘স্বামীদেবতা’টির প্রতি কি পরিমাণ বীতস্পৃহ, তা জেনেও মাল্যবানের কোনো ক্ষোভ বা রূপান্তর লক্ষ করা যায় না। রুথ্ ভানিতাএবং সেলিম কিদওয়াই সম্পাদিত ‘Same-sex love in India’ বইটির একজায়গায় বাৎসায়নের কামসূত্র প্রসঙ্গে বলা হয়েছে “The tritiya prakriti literally ‘third nature’ is maintained in the initial classificatory chapter. Danielou translates this as ‘third sex’ but ‘third nature’ is more accurate and suggests too the wider connections of the term. The medieval commentator Yashodhara (c.a. twelfth century A.D.) explains that ‘the third nature’ is napunsake, neither man nor woman.* জীবনানন্দের গল্প - উপন্যাসের পুরুষ বা স্বামী চরিত্রেরা বেশির ভাগই এইরকম কিম্পুরুষ ধরণের। হতাশাগ্রস্ত, অতি রোম্যান্টিক। কিন্তু সাধারণ বাঙালি পুরষের চারিত্রিক বিশেষত্ব তাদের মধ্যে নেই। প্রেম - অনুভূতি তাদের মনন ও আবেগকে তোলপাড় করে দিয়েছে অথচ কামনার দীপ্তি চোখে পড়েনা। স্ত্রী অথবা প্রেমিকা, কারও প্রতি-ই তাদের উৎসাহ নেই। সবচেয়ে বেশি করে সঙ্গির প্রতি শারীরিক বিনিময়ের অভাব আমাদের ভাবিয়ে তোলে। লেখক স্পষ্ট ভাষায় বাংলা উপন্যাস ও গল্পের কেন্দ্রীয় স্বামী- দর্শনের অন্যমেরুতে অবস্থানের কথা ইঙ্গিত করেননি, কিন্তু স্ত্রী-চরিত্রের বিরক্তি ও বিষোদগারের মধ্যে থেকেই মাল্যবান বা সুতীর্থ -র মত চরিত্রেরশারীরিক যৌন - অক্ষমতার প্রশ্নটা ঘুরে ঘুরে আমাদের এক নতুন জগত দেখানোর প্রয়াস করে।

১৯৩২ সালে লেখা ‘হৃদয়হীন গল্প’ -এর অমরেশকে জীবনানন্দ এইভাবে দেখালেন - /কী চায় সে ? একজন মেয়েমানুষ বা পুরুষ পেলেও চলে তার। সীতানাথকে পেলেও হয়। নিজে সে বিশেষ কিছু তেমন কথা বলতে পারে না, কিন্তু অন্যের কথা খুব শুনতে পারে সে, শুনতে চায় ও।

দালানের কোঠার ভিতরে বসে বধূ অনর্গল কথা বলে যাচ্ছে।* অর্থাৎ প্রতিমুহূর্তে অমরেশ বধূর জন্য প্রতীক্ষা করে থাকে,যদি সে আসে আর কারণে অকারণে তুচ্ছ দুটো কথাও বলে - তাহলে অমরেশ কৃতার্থ হয়ে যাবে। /দুপুরবেলা দরদালানের বারান্দায় খেতে বসে অমরেশ আজ আর ঘাড় গুঁজে থাকতে পারল না বেশিক্ষণ। চোখ তুলে চারদিকে না তাকিয়ে কিছুতেই সে পারল না। নীলিমাকে দেখতে পেল না অবিশ্যি। কিন্তু তবুও কয়েকবার এক কোঠা ছেড়ে অন্য কোঠার অন্তরতম অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে ফিরতে লাগল এই স্বামীটি।* পাশাপাশি মনে পড়বে রবীন্দ্রনাথের ‘ঘরে - বাইরে’র নিখিলেশ, ‘মালঞ্চ-র আদিত্য বা ‘চতুরঙ্গ’ এর শ্রীবিলাস - কে। সন্দীপ ও বিমলার সম্পর্ক জানতে পারার পর নিখিলেশ কি সম্পূর্ণ প্রতিক্রিয়াহীন হয়ে থাকতে পেরেছে ? তার বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিত্বের ভেতর লুকিয়ে - থাকা যন্ত্রণা বিমলার কাছে পৌঁছতে দেরি হয়নি। অন্যদিকে জীবনানন্দের গল্পে স্বামীরা যে মর্মন্তুদ অবস্থার শিকার - তার প্রতিও লেখকের কোনো সহমর্মিতা বা স্বীকৃতি নেই। নিরেট পাথরের মত তাদের হতাশা, কোনদিন বিলুপ্ত হবার নয়। কোনদিন সে বিষাদ - গুহা থেকে মুক্তির কোনো পথ খোলা নেই ওদের জন্য। তাই দারিদ্র্য না থাকলেও অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্যের যে অভাব, নিশ্চিত চাকরির যে সম্মানজনক অবস্থান পরিবারের মধ্যে তারা পেতে পারতো - তাও তাদের কপালে জোটেনি। বেশির ভাগ-ই শিক্ষিত বেকার, চাকরির খোঁজে হন্যে হয়ে রাস্তায় ঘুরছে। যোগাড় হয়নি তখনো। কিংবা আগামী দিনে লেখক হবার স্বপ্নে তারা সুবোধ বা সুকুমারের মত নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। সংসার একান্নবর্তী হোক বা একক, পুরুষটির বড় হবার প্রতি কারও কোন পৃষ্ঠপোষকতা দেখতে পাই না। স্বামীটি সম্পূর্ণ একা, নির্জনতম।

মৃত্যুর মুহূর্তে দামিনী বলেছিল শ্রীবিলাসকে -‘সাধ মিটিল না। জন্মান্তরে যেন তোমাকে পাই।’ ‘স্বামী-দেবতা’র মূর্তিতে কয়েক মাসের সফলতম দাম্পত্যের অঙ্গীকার দামিনীর জীবনের শেষ কয়েক দিনগুলোতে উজ্জ্বল হয়ে আছে। অন্যদিকে আমরা পাচ্ছিরবীন্দ্রনাথের ‘শাস্তি’ গল্পটি, যেখানে দুখীরাম ও ছিদাম এই দুই ভাই -এর মধ্যে আকস্মিকভাবে এসে পড়েছে চন্দরা নামের বউটি। ছিদাম নিজের ভাই-এর কৃতকর্ম চাপিয়ে দিয়েছে স্ত্রীর কাঁধে। স্ত্রীকে অন্যায়ভাবে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে সে। গাঁয়ের ছটফটে পাড়া-বেড়ানো রাগী মেয়েটিকে জব্দ করে জমিদারপুত্রের প্রতি ঈর্ষায় ও অবদমিত ক্রোধে ছিদাম এ-কাজ করেছে। এই বর্বর ‘স্বামী রাক্ষসে’র দাঁত - নখ বেরিয়ে পড়েছে গল্পের চূড়ান্ত পর্যায়ে। কিন্তু এ দুই স্তরের কোনোটার মধ্যেই জীবনানন্দের গল্পের নায়কেরা পড়ছেনা। লেখকেরভাষায় ‘না মরদের মত’। কিন্তু একদিকে যেমন আছে সোমনাথ, রণজিৎ আবার অন্য পিঠে আঠে প্রকাশ, শশধর, অজিতের মত স্বামীরা। ‘সোমনাথ ও শ্রীমতি’ শ্রীমতি প্রকাশিত হয়েছে ‘দেশ’ পত্রিকায় ২৬ ডিসেম্বর ১৯৯৮ সংখ্যায়। সোমনাথের অক্ষমতার সুযোগনিয়ে ওরই ভাই সুরনাথ শ্রীমতির ‘তনু শরীরের আশ্চর্য তপঃক্লেশ থেকে ধীরে ধীরে উপচীয়মান আমোদের মতো’ আহ্লাদ গ্রহণ করতো। অন্যদিকে সোমনাথ নিজের অর্থনৈতিক গরিবির প্রদর্শন করে স্ত্রীকে দিয়ে সুরনাথের আনুকূল্যে চেঞ্জে বেড়িয়ে পড়া, সেখানে হিটারের ব্যবস্থা ও অন্যান্য সমস্ত ব্যয়ভার বহন করা - সোমনাথ এইভাবে স্ত্রীকে ব্যবহার করেছে। গল্পের শেষাংশে শ্রীমতি বাড়ি ছেড়েঅন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় চলে যাচ্ছে এবং সোমনাথ খবর পেয়েছে যে মৃত ছেলে প্রসব করতে গিয়ে শ্রীমতির মৃত্যু হয়েছে। নর-নারীর শারীরিক ক্লেদ এইভাবে চূড়ান্ত একটি পর্যায়ে পৌঁছে দিলেন জীবনানন্দ। তাই শ্রীমতিকে আর বাঁচানো গেল ন। এই গল্পে আমরা দেখেছি সোমনাথের প্রাথমিক বুদ্ধি - বিবেচনা। প্রাণের আড়ালে লুকিয়ে থাকা ‘স্বামীরাক্ষস’টিকে। নিজের অসামর্থ্য সত্ত্বেও সে স্ত্রী ওপর কিছুটা স্বামীত্বের দাবি জানাতে পেরেছে।

বাংলা সাহিত্যের গল্প উপন্যাসের ধারায় বিশশতকের শেষ দুই দশক হল বাঙালির বহুমুখী চিন্তা - চেতনার এক পরিবর্তনের সূত্রপাত। দুলেন্দ্র ভৌমিকের ‘ঘরের মানুষ’ গল্পে দেখি দিব্যেন্দু ও রুমা কাঁকুরগাছির যে -নতুন ফ্ল্যাটে এসে উঠেছে, তাদের নতুন প্রতিবেশী হল দিব্যেন্দুর প্রথম স্ত্রী ঊর্মি ও তার দ্বিতীয়পক্ষের স্বামী অঞ্জন। একদিনের রুমার অনুপস্থিতিতে দিব্যেন্দু দ্বিধা করতে করতেও ঊর্মীর ফ্ল্যাটে কিছুক্ষণের জন্য প্রবেশ করেছে। এই গল্পের ঘটনাটি বলবার উদ্দেশ্য হল জীবনানন্দের পুরুষ-চরিত্রের অস্বাভাবিক নির্মাণ-কৌশলটিকে তুলনামূলক আলোচনার মধ্যে থেকে স্পষ্ট করে দেখানো। বহু বছর পর ঊর্মির প্রতি যে ফল্গু আগুন ও আক্ষেপ দিব্যেন্দুর সমস্ত সত্তাকে এক অদ্ভুত টানাপোড়েনের মুখে ফেলে দিয়েছে তার প্রকাশ ঘটেছে এইভাবে /দিব্যেন্দু আর দাঁড়াতে পারছিল না। অথচ তার ভেতরে কীসের যে অদৃশ্য টান সে অনুভব করছিল। বিচিত্র এক অলৌকিক ক্রিয়া তার মধ্যে কাজ করছে। ন’বছর পরে সে আজ হঠাৎ ধরতে পারল ঊর্মির সমস্ত চিহ্ন চোখের আড়াল করে ফেললেও ঊর্মিকে সে আড়ালে রাখতে পারেনি। তার নিয়তি আবার তাকে ঊর্মির মুখোমুখি এনে দাঁড় ককিয়ে দিয়েছে। দিব্যেন্দু হাতের ব্যাগ ডিভানে ছুঁড়ে দিয়ে ঊর্মির কাছে সরে এল। উর্মি দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে আছে। ওর ঠোঁট কাঁপছে।... দিব্যেন্দু গাঢ় গলায় ডাকল, ‘ঊর্মি।’ অন্তর্নিহিত উচ্ছ্বাসের এই প্রগলভতা জীবনানন্দের গল্পে পুরুষ - চরিত্রের কেন্দ্রীয়তাকে ধরে রাখতে পারেনি। অতিমাত্রায় ভাবপ্রবণ, যাকে প্রায় যুক্তিহীন ভাবালুতার পর্যায়ে ফেলা যায়- সেই ধরণের মানসিকতার চরিত্র জীবনানন্দ বারংবার ঘুরে - ফিরে নির্মাণ করেছেন। সক্রিয় প্রেমের দুরন্তপনা তো নয়-ই, এমনকি সাধারণ কথা কাটাকাটি বা মনোমালিন্যের কারণে জীবনানন্দের গল্পের স্বামীরা স্ত্রীসঙ্গ পরিত্যাগ করে। মাসের পর মাস এক অস্বাভাবিক দাম্পত্যের ওপর নির্ভর করে নিজের আকাঙক্ষার ব্যর্থ শিকার হয়ে একক জীবন অতিবাহিত করে। তাঁর গল্পের মূল লক্ষ্য যদি দাম্পত্য সম্পর্কের মনস্তাত্ত্বিক বিনিময়ের সংকট হয়ে থাকে, সেক্ষেত্রে আমাদের প্রায় সমকালে প্রকাসিত আশালতা সিংহের গল্পের কথা মনে পড়বে। ১৩৪০ সালে প্রকাশিত হয়েছে ‘সুরমার সংযম’ নামের একটি গল্প। সুরমা ও সুবোদের দাম্পত্যের মধ্যে অভিজাত্য ও স্বাধীনতার একটা মেলবন্ধন ছিল। ঐরমা স্বামীর অনুমতি ও ইচ্ছানুসারে বিভিন্ন পুরুষ বন্ধুর সান্নিধ্যে এসেছিল। কিন্তু হরলালে অভিনিবেশে প্রাথমিক পর্বে সুরমার মনে একটা নতুন আবেশ তৈরি হয়েছিল। গল্পের ৭ পরিচ্ছেদেদেখি ছ-টার শো দেখে ফিরবার পথে হরলাল সুরমার বাড়িতে একটু জল খাবার অজুহাতে দুদণ্ড অপেক্ষা করছে এবং /হঠাৎ হরলালজোর করে আকর্ষণ করে সুরমাকে নিজের কাছে টেনে নিয়ে এল। আর একটু হলেই সে কি করত বলা যায় না।* জীবনানন্দের রচনায় প্রেমের এ হেন শারীরিক অভিবাদন স্বামী - স্ত্রীর সম্পর্কে কোনরূপ সিদ্ধান্ত তৈরি করতে পারেনি। পরিবর্তে দু-পক্ষের তিক্ততাদিনের পর দিন বেড়ে চলেছে।

‘আকাশলীনা’র অন্দরে লুকিয়ে - থাকা আহত যুবকটি জেনে গেছে যে সুরঞ্জনা নামের মেয়েটি ফিরে আসবে না। ‘অইখানে যেয়ো নাকো তুমি/ বোলো নাকো কথা অই যুবকের

সাথে'/ -এই দুটি ছাত্রের বিন্যাস আমাদের বুঝিয়ে দেয় যে, সম্পর্ক খুব ঘনিষ্ঠ হলেও মেয়েটি অন্য পুরুষের সঙ্গে চলে গেছে। আর বনলতা সেন ?' তার মধ্যে কবি - মানসীর স্বপ্নপূরণ। কবি দেখালেন আধুনিকা বাঙালিনীর এমন চরিত্র, মেধায় - মননে যে পুরুষের জীবন - নিয়ন্ত্রক আবর্তনের জন্মমৃত্যুচক্রে ঘুরতে - ঘুরতে এক হলমার জন্য তার দেখা পাওয়া যায়। 'এতদিন কোথায় ছিলেন' - এই প্রশ্নে কোনো অপেক্ষা নেই, অথচ অস্ফুট এক আবদার লুকিয়ে আছে। 'হাজার বছর ধরে' পথ হাঁটার শারীরিক বীরত্ব অথবা আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য যার কোনোটাই নেই, সেই কবি - পুরুষটির কাছে বনলতা সেন একটা নতুন কিছু। তার জিজ্ঞাসার উষ্ণতাটুকু মাথায় রেখে থাকছে 'আপনি' ঐস্বোধনের স্থায়ী দুরত্ব। বনলতা সেন তার সামাজিকপ্রতিষ্ঠা নিয়েই কবির কাছে পরিচিত। তাকে আজ পর্যন্ত কোনো পুরুষ কোনোদিন উৎপলা বা সরযুর মত গৃহিনী করে তুলতে পারবে না ঃ এই 'wish fulfilment' বা কামনাপূরণের প্রতিমা দৃশ্যের হয়ে উঠেছে 'বনলতা সেন'।

কবি এখানেই থামলেন না। শেষ দৃশ্যের মহিমা আরও আশ্চর্য। 'থাকে শুধু অন্ধকার, মুখোমুখি বসিবার বনলতা সেন' -এক নিঃশ্বাসে কবি বলে গেলেন। যুগযুগান্ত ধরে এই মুখোমুখি বসার একখণ্ড সময় - বিন্দু বেড়ে চলল। কিন্তু অবস্থান-দৃশ্যটি আমাদের কাছে কি নতুন নয়? চিত্রাঙ্গদা অর্জুনকে বলেছিল সে পুরুষের পাশে থাকবে সহচরী হয়ে, জীবনের সুখে ও দুঃখে, নর্মে ও কর্মে সে থাকবে স্বামীর সাপেক্ষে। কিন্তু 'মুখোমুখি' নারী ও পুরুষের এই যুগ্ম নিরপেক্ষ সহাবস্থান আমাদের কাছে বাংলা কবিতায় এক নতুন আস্বাদন। তাই নারী ও পুরুষের ঘনিষ্ঠ অথচ নীরব দূরত্বটুকু অর্জননের জন্য বিবাহ নয়, এক অস্থায়ী অনিশ্চিত বন্ধুত্বপূর্ণ সহাবস্থানটই চাই।

জীবনানন্দ ব্যক্তিজীবনে গভীরতম সংকটকে তাঁর গল্পের কেন্দ্রীয় পুরুষচরিত্রের আড়ালে উন্মুখ করে দিলেন। দাম্পত্য সম্পর্কের অসহযোগ আর অসহিষ্ণুতা কাটিয়ে ওঠার কি কোনো রাস্তাই খোলা ছিল না শিল্পীর? প্রথম সমাধান, যদি স্বামীটি মোটামুটি সচ্ছল হয়, কর্মক্ষম হয় অন্ততপক্ষে কবি বা লেখক না হয় -সেক্ষেত্রে সে স্বামীর বরাত কিছু ভাল। দ্বিতীয় সমাধান, বিবাহিত নারী অথবা পুরুষের জীবনে দ্বিতীয় পুরুষ বা নারীর অস্তিত্ব। এ কথাটা স্পষ্ট করে কোথাও না বললেও ইঙ্গিত করেছেন কয়েকটি গল্পে। 'শাড়ি' গল্পে যেমন উষা মেয়েটি। সে রণজিতের ঔদাসীন্যকে তোয়াক্কা না করে কিশোর রমেনকে কয়েকদিনের জন্য নিজের বাড়িতে আমন্ত্রণ জানাতে চায়। আই. এ. পরীক্ষার পর সে উষাদির বাড়ি বেড়াতে আসতে চেয়েছে। উষা স্বামীর অনুমতি না নিয়েই ছেলেটিকে নিজের সংসারে রাখতে চাইছে, শেষ পর্যন্ত এমন কথাও বলেছে যে, রণজিতের বিছানাতেই থাকবে রমেন, রণজিতের মশারি টাঙানো হবে ও মাথার ওপর। 'যাই বল, তাই বল, আমি রমেনকে আনবই' - উষার জেদ। রণজিতের কানে যায়নি দেখে উষা আবার বলেছে 'আমি আজই লিখে দেব রমেনকে সিধে চলে আসতে।' কয়েকদিনের ন্যৈ স্বাপ্ন দেখেছে বউটি। রমেনের মধ্যে দ্বিতীয় পুরুষটিকে কামনা করেছে অস্ফুটভাবে। শেষ পর্যন্ত তাও জোটে নি তার। চিঠি লিখেও কুচি - কুচি করে ছিঁড়ে ফেলতে হয়েছে। সেই প্রতিহিংসায় শাড়িওয়ালার সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয় উষা। এমন সব দামি - দামি শাড়ি বেছে নিয়েছে -যা কিনে দেবার ক্ষমতা নেই রণজিতের সংশয়, অচরিতার্থ অর্থনৈতিক ক্ষমতাকে 'জিরো' প্রমাণিত করার এই কৌশল মেয়েলি হলেও জীবনানন্দের নির্মিত পুরুষচরিত্রের তুলনায় বীরত্বসূচক।

একটি সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার পর থেকে স্ত্রী - দের মধ্যে স্বামী - সান্নিধ্যের যে অনীহা, তাকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য দ্বিতীয় পুরুষের আবিষ্কার। মেয়েটি সহবাস - বিমুখ বলে কি 'স্বামীরাক্ষস'টিও মূক হয়ে থাকবেন? এই তত্ত্বটি একটু কেমন - কেমন ঠেকো। স্বামী জোর করবে না? আদরে - সোহাগে সারা রাত্রি ভরিয়ে তুলবে না? এইভাবে ভেঙে যাবে দুজনের প্রেম আর প্রয়াস! তবে কিম্পুরুষের স্বাভাবিক libido-র যথেষ্ট অভাব ও ঘাটতি তার মধ্যে বর্তমান? তারই প্রকাশ কি দেখতে পাচ্ছি সুরঞ্জনার প্রতি ব্যাকুল খেদোক্তি ও নিষেধের ভেতরে? 'বাসররাত' গল্পটি এইরকম। পুরুষটির নাম রাখা হল প্রেমনীহার। নতুন বিয়ে - করা - বউ মণিকা। বাসররাতে শুয়ে শুয়ে একা ভাবছে বউয়ের রূপের কথা। /রং ফরশা তো নয়ই, শ্যামও নয়, কিন্তু তবু ও কালিন্দীর পারে কিশোর কৃষ্ণের মতো যেন এই মুখখানা, নাকের ডগাটি কেমন খাড়া হয়ে উঠেছে বাঁশির মতো, টানা টানা চোখদুটোকে যেন কোকিলের কালো পালক দিয়ে একে একে কানের পাশে জুলপি অবধি টেনে এনেছে।* মণিকা তাকে আমল দেয়নি। কলকাতায় তাদের ভাড়া-বাড়ি। পৈতৃক অবস্থা খুবই খারাপ। মণিকার মনে ধরেনি প্রেমনীহারকে। সে তাকে একদিনের জন্যেও বর হিসেবে গ্রহণ করেনি। মনে - মনে সে স্বয়ম্বরা। তাই বিয়ের কয়েকদিনের মধ্যেই অন্য একটি বিয়েবাড়িতে গিয়ে সুষমাবাবুর সঙ্গে তার ভাব জমাতে কোনো দ্বিধা নেই। /শাড়ির ভেতর থেকে একটা শ্বেতপদ্মের তোড়া বের করে বললে, 'সুষমাবাবু আমাকে দিয়ে গেছেন।' প্রেমনীহার বললে, 'সুষমাবাবু?' -'হ্যাঁ, বরের মেজভাই। কেমন দিব্যি মানুষের মত দেখতে, পুরুষমানুষ যাকে করে রেখেছেন।'' যে-পুরুষ সম্ভ্রান্ত, পয়সাওয়ালা তিনি মণিকার চোখের মণি। তার নামের মধ্যেও 'পুরুষমানুষ' এর গন্ধ। আর স্বামী তার কাছে অস্পৃশ্য। এমন এক দাম্পত্যের আখ্যান আগে আমরা পাইনি। পুরুষটির জোর ফলানোতেই আমরা অভ্যস্ত, কিন্তু সে যে নিজেই কতখানি ভ্রান্তবাসী, উপেক্ষিত, সবচেয়ে বেশি করে ঘরণীর কাছেই - তা বুঝতে গেলে জীবনানন্দের গল্প-উপন্যাসের দুচার পৃষ্ঠ উল্টে দেখলেই অনুধাবন করা যায়।

উপন্যাসটির পুরুষ চরিত্র বলতে প্রেম-নীহার। আর নামকরণে লেখক কী ইঙ্গিত করার চেষ্টা করেছেন? যুগ্ম শব্দদুটির একক ব্যবহার অস্বাভাবিক মানসিক প্রবণতাকে আভাস করেছে, আবার অন্য দিকে নারী - পুরুষ এর মিশেলও বোঝাতে পারে বলে আমাদের মনে হয়। এই ধরণের নামকরণের সহাবস্থান আমরা লক্ষ্য করেছি ২০০১ সালে প্রকাশিত আবুল বাশারের 'নরম হৃদয়ের চিহ্ন' উপন্যাসটির ক্ষেত্রে। মরমীর বিশ্বাসযোগ্য বন্ধু ও আশ্রয় কুন্দন - রক্তিম। সে নিজে চিকিৎসক। মরমীর কথামত সে তার অস্ত্রোপ্রচার করে তাকে মুক্তি দেবে, এই ছিল তার ভূমিকা। অন্যদিকে কুন্দন রক্তিমের গূঢ় মনস্তত্ত্বের মরমীর এই শারীরিক সংকট-টাই এনে দিয়েছে এক আশ্চর্য প্রেমের উপলব্ধি। মরমীর নিষিদ্ধ নারী - প্রত্যঙ্গের সৌন্দর্য, তার মেধা ও লজ্জা, বন্ধুহীনতা তাকে এক জটিল বৃত্তের মধ্যে আহ্বান করে এনেছে। জীবনানন্দ দেখিয়েছেন যে প্রেম-নীহারের মধ্যে স্বাভাবিক পুরুষালি কামের অভাব আছে। সে স্ত্রীকে যেভাবে ভালবাসে প্রকাশ করেছেন, তাতে মণিকা তাকে আরও অপছন্দ করেছে। লেখক প্রেম - নীহারের বাঁশির মতো নাকের ডগা, 'টানা টানা চোখদুটো' যেভাবে অপুরুষালি কমনীয়তার পরিচয় দিয়েছেন, তার সঙ্গে মরমীর নারী - দেহ - প্রস্ফুটন-বর্ণনার একটা সংযোগ সহজেই দুটি গল্প - চৌহদ্দি থেকে আমাদের সামনে ধরা পড়ে।

এক ব্রাত্য রুইদাস পরিবারের ভেতর থেকে রবীন্দ্রনাথ আঁতের কথা টেনে বার করে দেখালেন। 'শাস্তি' গল্পে বলা হয়েছেঃ 'চন্দরাকে যখন তাহার স্বামী খুন স্বীকার করিয়া লইতে কহিল, সে স্তম্ভিত হইয়া চাহিয়া রইল; তাহার কালো দুটি চক্ষু কালো অগ্নিরন্যায় নীরবে তাহার স্বামীকে দগ্ধ করিতে লাগিল। তাহার সমস্ত শরীর মন যেন ক্রমেই সংকুচিত ওইয়া স্বামীরাক্ষসের হাত হইতে বাহির হইয়া আসিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। তাহার সমস্ত অন্তরাত্মা একান্ত বিমুখ হইয়া বাহির হইয়া আসিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। তাহার সমস্ত অন্তরাত্মা একান্ত বিমুখ হইয়া দাঁড়াইল।* 'প্রণয়ী-প্রণয়িনী' গল্পে ঘটলো এক অদ্ভুত কাণ্ড। শশধর যখন অপ্রত্যাশিতভাবে বাড়ি ফিরে বিরজা ও রমেশকে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে পাশাপাশি বসে থাকতে দেখতে পেল, সে রমেনকে একবারও বিরাজ সম্পর্কে কোনো কটুক্তি করেনি। কিন্তু রমেশ ও শশধরের সংঘাত বেধেছে প্রকাশ্যেই পরদিন রমেশ আবার এসেছে, কিন্তু বিরজার আচরণ বদলে গিয়েছে রমেশের শঠতা ও স্বার্থপরতায়। শশধর কিন্তু বউকে সন্দেহ করেনি। সন্দেহের বশবর্তী হয়ে সে বাড়িতে পাহারা দিয়ে বসেও থাকেনি। অন্যদিকে ঘনীভূত হয়ে উঠেছে রমেশের ঈর্ষা, প্রশ্ন ও অবৈধ জিজ্ঞাসা। পরদিন এসে বিরজার কাছে তার প্রধান প্রয়োজন হল এটা জানার যে, গতরাতে তাদের মধ্যে কি কি ঘটেছিল। বিরজা একাধিকভাবে এই জিজ্ঞাসার জবাব দেয়নি, দিতে অস্বীকারকরেছে। শেষে এও বলতে দ্বিধা করেনি যে রমেশ যেন আর কোনদিন না আসে। শশধরের এই জয় জীবনানন্দের গল্পে এক ব্যতিক্রমখাড়া করেছে। যেমন 'পাতা তরঙ্গের বাজনা' গল্পেও আমরা দেখি সুকুমার অতসীর সঙ্গে আর কখনোই দেখা করতে পারেনি। দেবেনের দুই পাশে মোটরগাড়ির সিটে বসে অতসী হাসি - হাসি মুখে স্বামীর অনুগামিনী। এইরকম দু একটি নিদর্শন থাকলেও সাধারণত স্বামীরাই কবির গল্পে মধ্যবর্তী এক স্থবির অবস্থান - স্ত্রীর চেতনায় যার কোনো স্থিতিস্থাপক সংবেদ তৈরি হতে পারেনি।

আশির দশকে 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত সন্তোষকুমার ঘোষের 'মধ্যবতী' গল্পটা এই কয়েকটি পূর্বস্মৃতি টেনে শুরু হয়েছে - 'ঠিক (দুইজনের) মধ্যিখানে সেই মৃত বালিকাটি শুইয়া রহিল, দুইজনের কেহ তাহাকে লঙ্ঘন করিতে পারিল না।' রবীন্দ্রনাথের 'মধ্যবর্তিনী' গল্পের এই আপ্তবাক্যটির প্রেক্ষিতকে মনে রেখে গল্পটি এমন এক নাটকীয় অবস্থায় দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকে পড়েছে। এ গল্পে স্বামী - স্ত্রীর মধ্যে থাকছে দ্বিতীয় পুরুষের অস্তিত্ব, কিন্তু জীবনানন্দের কলমে অধিকাংশ স্বামীরাই /মধ্যবর্তী', লেখক হলে তো কথাই নেই।

'Metaphysics of live of sexes' বইটিতে শোপেনহাওয়ার নর - নারীর প্রেম পুরুষ- মনস্তত্ত্বকে যে-ভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন, জীবনানন্দের সৃষ্টস্বামীরা সকলেই তার বিপরীত। পারস্পরিক দেহ - সম্প্রদানের ক্ষেত্রে, পুরুষের প্রেমের আকুতি নিরন্তর হ্রাস পায় আর মেয়েটি আরো বেশি করে ভালবাসতে পারে - অন্তত সন্নিবিষ্ট বোধ করে; জীবনানন্দের গল্প এ থিয়োরিকে ভুল প্রমাণ করে দিয়েছে। পুরুষের প্রেরণা নেই,কর্মক্ষেত্রে বা জীবিকায় সে অকৃতকার্য। সেই ব্যর্থতার বোধ তাকে প্রেমের প্রতি আকুতি - প্রবণ রেখেও যৌনসম্পর্কে উদাসীন করে দিয়েছে। এই মনস্তাত্ত্বিক অনুর্বরতা তাকে ঠেলে দিয়েছে এক ভয়গ্রস্ত অস্বাভাবিক জরায়। স্ত্রীর সঙ্গে তার সহজ সক্রিয় সম্পর্ক ভেঙ্গে গিয়েছে। সন্তানের প্রতিও তার বাৎসল্যের উৎসাহ লক্ষ করা যায় না। 'মেয়েমানুষ' গল্পটি মনে পড়ে। 'নিরাশার অতল অন্ধকূপের ভিতর ডুবে গিয়ে হেমেন স্তব্ধ হয়ে চুরুট টানতে লাগল। জীবনে প্রেম হল না, প্রণয় হল না, ছেনালি অবধি হল না। একজন পরেরস্ত্রীকে আটকে রেখে মোকদ্দমায় যদি সে লড়ত, তাহলেও যেন একটা ক্ষোভ মিটত।' -অর্থাৎ পরকীয়া-ই হল এই জরা-মুক্তির একমাত্রসঞ্জীবনী। কিন্তু সেগুড়েও বালি। আফশোসটাই সর্বস্ব। তার বাইরে, সাংসারিকতার অন্যগ্রহে পৌঁছনোর উদ্দীপনা এদের মধ্যে দেখা যায় না। এই ব্যাধিগ্রস্ত বিষণ্ণ দাম্পত্যের ছবি জীবনানন্দের কথাসাহিত্যে একটি আর্কেটাইপাল থিম হিসেবে ঘুরে - ঘুরে এসেছে। 'বনলতা সেন'-ই তার একটিমাত্র 'দূরতর দ্বীপ'। একটা সবুজ আপ্যায়ন।

আপন মাতৃভাষার সম্মান রক্ষার দাবি নিয়ে একদা বাংলার আপামর জনসাধারণকে জীবন বাজি রেখে লড়াই করতে হয়েছে। পৃথিবীতে এমন দ্বিতীয় নজির আর হয়েছে কিনা ইতিহাস তার সাক্ষ্য দেবে। ১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসে দেশ ভাগের পর পাকিস্তানের সৃষ্টি থেকেই রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কে বিভিন্ন অঞ্চলের জনসাধারণের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দেয়। তৎকালীন পাকিস্তানের কর্ণধাররা ভাষাবিষয়ক সৃষ্ট সমস্যা সমাধান না করে শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে বিষয়টিকে আরো জটিল করে তোলেন। অথচ বাংলার জনসাধারণের মধ্যে বাংলা ভাষার পরিবর্তে উর্দুভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার কোনো গ্রহণযোগ্য যুক্তিই কর্ণধারদের মধ্যে ছিল না।

এ সম্পর্কে অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম তাঁর ‘ভাষা আন্দোলন ও শহীদ মিনার’ গ্রন্থে বলেছেন, /দেশ বিভাগের সময় ভাষাতাত্ত্বিক দিক থেকে পশ্চিম পাকিস্তান পাঞ্জাবী, সিন্ধী, পশতু, বালুচী, ব্রাহুই এবং পূর্ব পাকিস্তান বাংলা ভাষাভাষী অধ্যুষিত অঞ্চল ছিল। দেশ বিভাগের পর ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বিভিন্ন ভাষাভাষী মুসলমানেরা ব্যাপক সংখ্যায় পশ্চিম পাকিস্তানে এবং স্বল্প সংখ্যায় পূর্ব পাকিস্তানে হিজরত করলেন পাকিস্তানে প্রায় শতকরা আড়াইভাগ উর্দুভাষী নাগরিক সংযুক্ত হয়। সরকারী পরিসংখ্যান অনুসারে ১৯৪৮ সালের শুরুতে পাকিস্তানের মোট ছয় কোটি নব্বই লক্ষ মানুষের মধ্যে চার কোটি চল্লিশ লক্ষ জন ছিল বাংলা ভাষাভাষী*। এতদসত্ত্বেও পাকিস্তানী প্রশাসন পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালীদের অবজ্ঞা করে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে উর্দুভাষার ব্যবহার প্রচলন করেন।

এসময়েই পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালি বুদ্ধিজীবীরা সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার জন্য মতামত ব্যক্ত করতে থাকেন। তৎকালীন দৈনিক আজাদ পত্রিকার সম্পাদক জনাব আবুল কালাম শামসুদ্দীন সাহেবের মন্তব্য এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারেঃ /মুছলমান রাজা বাদশারাই প্রকৃতপক্ষে বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধিশালী করিয়াছেন। ইসলামী প্রভাবের ফলে বাংলাভাষা ক্রমোন্নতি লাভ করে এবং ইহার প্রসার হয়। প্রত্যেক বাঙ্গালী মুছলমানের বুলি বাংলা। উর্দু কখনই বাঙ্গালী মুছলমানের ভাষা নয়। পশ্চিম পাকিস্তানে উর্দু রাষ্ট্রভাষা হইতে পারে, কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানে বাংলাই রাষ্ট্রভাষা হওয়া যুক্তিযুক্ত।* ১৯৪৭ সালের ৭ই নভেম্বর তারিখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সলিমুল্লাহ মুসলিম হলে /পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষা সমস্যা* বিষয়ে পূর্ব পাকিস্তান সংস্কৃতি বিজ্ঞান পরিষদের উদ্যোগে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সভায় ঢাকার শিক্ষাবিদ ও ছাত্ররা বক্তব্য রাখেন। সভার সভাপতি মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ তাঁর ভাষণে বাংলাভাষা সম্পর্কে বলেন, /শতকরা নিরানব্বই জন যে ভাষায় কথা বলে, সেই ভাষা ব্যতিরেকে অন্যভাষা তাহাদের উপর চাপাইয়া দিবার কোনো প্রশ্নই উঠেনা।...* উক্ত সভায় ভাষা সমস্যা নিয়ে ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ যে মন্তব্য করেছিলেন তা হলঃ /যাঁহারা বাংলাদেশে বাংলাভাষাকে ছাড়িয়ে কিংবা স্কুল কলেজে শিক্ষার মাধ্যম রূপে অথবা বাংলাদেশের আইন আদালতের ব্যবহার্য ভাষারূপে উর্দুর পক্ষে ওকালতি করিতেছেন আমি তাঁহাদিগকে কাণ্ডজ্ঞানবিহীন পণ্ডিত - মূর্খ ভিন্ন আর কিছুই মনেকরিতে পারিনা।*

ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত উর্দুভাষী পাকিস্তানীদের মনোভাব বুঝতে পেরে পূর্ব পাকিস্তানের সচেতন ছাত্র সমাজ মাতৃভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় সোচ্চার হয়ে আন্দোলনে নেমে পড়ে। বৃটিশ শাসিত ভারতবর্ষে যেমন চাকুরী ও ব্যবসায় ইংরেজি ভাষা জ্ঞানধারীরা সুযোগ - সুবিধা ভোগ করেছিল তেমনি পাকিস্তানের সংখ্যালঘু উর্দুভাষীরাও অনুরূপ সুযোগ সৃষ্টি করতে চেয়েছিল। কিন্তু পূর্ব বাংলার জনগণ তা সফল হতে দেয়নি। ১৯৪৮ সালে পাকিস্তান গণপরিষদের প্রথম অধিবেশনেই বিরোধীদল দুটি সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করে। তার মধ্যে ২৩শে ফেব্রুয়ারি ১৯৪৮ তারিখের অধিবেশনে পূর্ব বাংলার কুমিল্লার প্রতিনিধি ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত উত্থাপিত প্রস্তাবে বাংলাভাষাকে স্বীকৃতিদানের দাবি উত্থাপন করেন। ১৯৪৮-এর ২৫শে ফেব্রুয়ারি ভাষাবিষয়ক প্রস্তাবটি আলোচিত হলে প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান এ প্রস্তাবের বিরোধিতা করে, প্রস্তাব উত্থাপনকারীর সততার প্রতিও কটাক্ষ করেন। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর সুরে সুর মিলিয়ে পূর্ব বাংলার প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিনও ভাষা বিষয়ক প্রস্তাবটির বিরোধিতা করেন।

একই সময়ে সিলেট থেকে প্রকাশিত প্রগতিশীল সাপ্তাহিক ‘নওবেলাল’ পত্রিকা ৪ মার্চ ১৯৪৮ তারিখে ‘রাষ্ট্রভাষা’ বিষয়কএক দীর্ঘ সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। তাতে গণপরিষদের মুসলিম লীগ সদস্যদের উদ্দেশ্য বলা হয় যে, /আপনারা এইভাবে মাতৃভাষার মূলে যাহারা কুঠারাঘাত করিতেছেন, তাহারা কি একবারও ভাবিয়া দেখেন নাই সে ভাষার ভিতর দিয়াই জাতির আশা-আকাঙক্ষা,সুখ-দুঃখ, আদর্শ প্রভৃতি রূপ পাইয়া তাকে। ভাষা সম্পূর্ণ বিকাশ লাভ না করিলে জাতির মেরুদণ্ড গঠিত হইয়া উঠিতে পারে না। ইতিমধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রেরা ধর্মঘট করিয়াছেন এবং মিছিল সহকারে সর্বত্র বিক্ষোভ প্রদর্শন করিয়াছে। এই গণবিক্ষোভ যখন পূর্ণ আত্মপ্রকাশ করিবে তখন এইসব নেতাদের আসনও টলটলায়মান হইয়া পড়িবে।*

ভাষার প্রশ্নকে কেন্দ্র করে বাংলা ভাষীদের সেদিনের আন্দোলন বিশ্ববিদ্যালয়, পার্লামেন্ট, ঢাকা শহর ছাড়িয়ে বাংলাদেশের জেলা শহরগুলোতেও বিস্তারিত হয়েছিল। যার ফলে পুলিশের লাঠি-চার্জ হলো এবং বহু ছাত্র-জনতাও কারাবরণ করলো। এধরনের পরিস্থিতিতে ১৯৪৮ সালের ১৯শে মার্চ তারিখে জিন্নাহ সাহেব সাতদিনের সফরে ঢাকায় আসেন। এবং ২১শে মার্চ তিনি এক দীর্ঘ বক্তৃতার মাঝে ভাষা ও ভাষা আন্দোলন সম্পর্কে নানা মন্তব্য করেন। তারপরেও ২৪শে মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে কার্জন হলেও জিন্নাহ সাহেব রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কে প্রায় একই মতামত প্রকাশ করেন। ফলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সমাজ ক্ষুব্ধহয়ে সঙ্গে সঙ্গেই এর প্রতিবাদ করতে থাকে। পক্ষান্তরে ১৯৪৮ সালের পর ভাষা আন্দোলন দৃশ্যত কিছুটা স্তিমিত হয়ে এলে ষড়যন্ত্রকারীরা নানা কৌশলে বাংলা ভাষার আন্দোলনকে ভিন্ন খাতে সরিয়ে দিতে চেয়েছিল। এমনকি ১৯৫০ সালেও এই দুষ্ট শাসকচক্র বাংলাভাষার আন্দোলনকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে। কিন্তু ১৯৫১ সালে পূর্ববাংলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ১১ই মার্চ পালনের মধ্য দিয়ে ভাষা আন্দোলন বিষয়ে ছাত্র সমাজ আবার গর্জে উঠে।

১৯৫২ সালের ২৭শে জানুয়ারী প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন সাহেব ঢাকার পল্টন ময়দানে এক জনসভায় ভাষণ দিতে গিয়ে ‘পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু* উক্তিটি করেন। এ উক্তির কারণে বাঙালিদের বাংলাভাষার আন্দোলন আবার নতুন গতিলাভ করে। প্রধানমন্ত্রীর বিভ্রান্তিকর ভাষণের তিনদিন পরেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা প্রতিবাদস্বরূপ ধর্মঘটের আয়োজন করে। বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের আহ্বানে ধর্মঘট স্বতঃস্ফূর্তভাবে পালিত হয়। এ ধর্মঘটের সাফল্য, প্রভাবের পর ৪ঠা ফেব্রুয়ারী ঢাকা শহর এবং প্রদেশের সর্বত্র ছাত্র ধর্মঘট পালনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং ১১ই ও ১৩ই ফেব্রুয়ারি সাফল্যের সঙ্গে পতাকা দিবসও পালিত হয় এবং ‘রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই’ দাবি সম্বলিত ব্যাজ বিক্রয় করে ২১শে ফেব্রুয়ারী রাষ্ট্রভাষা দিবস পালনের জন্যঅর্থ সংগ্রহ করা হয়।

১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রভাষা দিবস পালনের লক্ষ্যে আহুত সাধারণ ধর্মঘটের ডাকে ক্ষমতাসীন সরকার বিচলিত হয়ে ২০শে ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যা ৬টা থেকে পরবর্তী একমাসের জন্যে ঢাকা জেলার সর্বত্র হরতাল, সভা, মিছিল ইত্যাদি নিষিদ্ধ করে ১৪৪ ধারা জারি করেন। কিন্তু ভাষা সৈনিকেরা সরকারের সকল প্রতিরোধ পরিকল্পনা সত্ত্বেও তাদের কর্মসূচি নিয়ে এগিয়ে যায়।২১শে ফেব্রুয়ারি তারিখেই ছাত্রদের মিছিলের উপর ঢাকার রাজপথে পুলিশ দিগবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে গুলিবর্ষণ করে। এই সংবাদ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে এবং ছাত্ররা প্রতিবাদ সভা ও মিছিলের আয়োজন করে। এই তারিখেই চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, সিলেট, রাজশাহী, পাবনা, নাটোর, বরিশাল, কুষ্টিয়া, বগুড়া, রংপুর, ময়মনসিংহ, জামালপুর, খুলনা, বিক্রমপুর, নারায়ণগঞ্জ ইত্যাদি স্থানে ভাষা আন্দোলনের সমর্থনে মিছিল ও শোভাযাত্রা বের হয় এবং সারা পূর্ব বাংলায় বাংলাভাষার সমর্থনে আন্দোলন শুরুকরে ছড়িয়ে পড়ে। ছাত্রদের উপর এই নির্মম গুলি চালানোর প্রতিবাদে পরিষদের কয়েকজন সদস্য প্রধানমন্ত্রীকে ঘটনাস্থল প্রত্যক্ষকরার জন্য অনুরোধ জানান। প্রধানমন্ত্রী নূরুল আমিন সে সময়ে পুলিশের পক্ষে সাফাই গেয়ে ১৪৪ ধারা ভাঙ্গার জন্য ছাত্রদের অভিযুক্ত করেন। প্রধানমন্ত্রির এহেন হৃদয়হীনতার প্রতিবাদে পরিষদ সদস্য আবদুল রশীদ তর্ক বাগীশ এক সময় উত্তেজিত হয়ে স্পিকারকে সম্বোধন করে তার মাধ্যমে সকল সদস্যকে পরিষদগৃহ ত্যাগ করার আবেদন জানিয়ে তিনি নিজে পরিষদ গৃহ ত্যাগ করেন।

বাংলা ভাষার জন্য যাঁরা শহীদ হয়েচিলেন তাঁদের স্মৃতিকে চিরস্মরণীয় করার জন্যই ১৯৫২ সালে ২২শে ফেব্রুয়ারি পরিকল্পনা গ্রহণ করে ২৩শে ফেব্রুয়ারি রাতের মধ্যে সেদিন বুঝতে পেরেছিল যে এ শহীদ মিনারই একদিন বাঙালি জাতির আত্মপ্রকাশের প্রতীক হয়ে প্রতিষ্ঠা পাবে। তাই তাদের নির্দেশেই সরকারি বাহিনী ২৬শে ফেব্রুয়ারি বিকেলের মধ্যেই এই শহীদ মিনারটি নিশ্চিহ্ন করে দেয়। পরে আবার ১৯৫৬ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারিতেই বর্তমান শহীদ মিনারের স্থান নির্বাচন ও ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হয়।সে বছরের ২৯শে ফেব্রুয়ারিতে পাকিস্তানের প্রথম সংবিধান গৃহীত হলে বাংলা ভাষা পাকিস্তানের অন্যতম উর্দুভাষার সাথে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে সাংবিধানিক স্বীকৃতি লাভ করে।

বিভিন্ন শিল্পী ও স্থপতিদের থেকে প্রাপ্ত নক্শা বাছাইয়ের দায়িত্ব পড়েছিল বিখ্যাত গ্রীক স্থপতি ডক্সিয়াডেস, চীফ ইঞ্জিনিয়ার এম. এ. জব্বার এবং শিল্পী জয়নুল আবেদীনের ওপর। তাঁরা সকলে শিল্পী হামিদুর রহমানের নক্শাটি অনুমোদন করেন। ১৯৫৭ সালের নভেম্বর মাসেই শহীদ মিনারের নির্মান কাজ আরম্ভ হলেও ১৯৫৮ সালে সামরিক শাসন জারি হবার শহীদ মিনারের কাজ বন্ধ হয়ে যায়। পরে এই মডেলটিকে ভিত্তি করেই ১৯৬৩ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারির পূর্বেই ছোট আকারের শহীত মিনার নির্মান করাহয়। ১৯৭১ সালে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর হাতে ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ার পূর্ব থেকে আজ পর্যন্ত এই শহীদ মিনারই বাঙালী জাতিকেএকের পর এক সংগ্রামের প্রেরণা দান করে যাচ্ছে।

ভাষা আন্দোলনের মতো আলোড়ন সৃষ্টিকারী ঘটনা যা বাঙালী জাতির জীবনে গভীর নাড়া দিয়েছে তার প্রভাব সমসাময়িক শিল্প - সাহিত্য ও সঙ্গীত যে পড়বে - তা অত্যন্ত স্বাভাবিক। আর এই কারণেই ১৯৫৩ সালের মার্চ মাসে হাসান হাফিজুর রহমানের সম্পাদনায় /একুশে ফেব্রুয়ারী* সংকলন প্রকাশ হয়। উক্ত সংকলনে একুশে ফেব্রুয়ারিকে কেন্দ্র করে প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা, গান নকশা ও ইতিহাস স্থান পেয়েছে। শওকত ওসমান, সাইয়িদ আতীকুল্লাহ, আনিসুজ্জামান, সিরাজুল ইসলাম ও আতোয়ার রহমানের গল্প এবং আবদুল গাফফার চৌধুরীর বিখ্যাত গান 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারী/আমি কি ভুলিতে পারি' গান ও এই সংকলনে ছাপা হয়। সেই থেকে আজ পর্যন্ত বাংলাদেশের সাহিত্যে ২১শে ফেব্রুয়ারি নানাভাবে রূপায়িত হয়ে আসছে। আরএই ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে উল্লেখযোগ্য গল্পের সংখ্যা তেমন একটা নেই, তবু কয়েকটি গল্পের মাধ্যমে তৎকালীন সমাজ্য জীবনের একটি চিত্র তুলে ধরতে সচেষ্ট হব।

১৯৫৩ সালের মার্চ মাসে প্রকাশিত হাসান হাফিজুর রহমান সাহেবের সম্পাদিত একুশের সংকলনে প্রথম গল্পটি ছিল শওকত ওসমান সাহেবের 'মৌন নয়' গল্পটি যা ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে লেখা। গল্পটির সংক্ষিপ্ত কাহিনীর মাঝে একটি প্রচণ্ড বিক্ষোভ ও বিরাট প্রশ্নের বিশাল ব্যাপ্তি যেন রয়েছে। একটি চলন্ত বাসে নিশ্চুপ হয়ে বসে আছে সকল যাত্রী। কথা নেই কারোর মুখেই। চট্টগ্রাম শহরের বিভিন্ন রাস্তা দিয়েই বাস আস্তে আস্তে এগিয়ে যাচ্ছে। বাসের কণ্ডাকটর ও ড্রাইভার কারো মুখেও কোনো শব্দ নেই। একজন শোকাহত বৃদ্ধ বাসের মধ্যে বসে আছেন। সবার নজরই এই বৃদ্ধের দিকে নিবদ্ধ। দুজন চাষী লোক বৃদ্ধের দুপাশে বসা। মনেহয় শহরের হাটে কোনো জিনিস বিক্রি করে এখন ফিরে যাচ্ছে। একজন ছাত্র বই হাতে আছে তার মুখেও কোনো কথা নেই। আজ যেন সবাই ভাষা হারিয়ে ফেলেছে। কিন্তু বাস এগিয়ে চলেছে।

যাত্রীরা যার যার ভাড়া নীরবে কণ্ডা*রের হাতে দিয়ে নেমে যাচ্ছে। কিন্তু আজ কণ্ডাকটর পয়সা মিলিয়ে নেবার কোনো প্রয়োজন বোধ করছে না। তার ভাবটা এরকম, যেন কেউ আজ তাকে ঠকাতে পারেনা অথবা তার চেয়েও বড় ক্ষতির দাগা খেয়েছে সে। তাই এ লোকসান তার কাছে তুচ্ছ। বৃদ্ধের হাত দুটি আছে, বুকেরই উপর। নিঃশ্বাস দ্রুত হয়ে আসছে বৃদ্ধের। হাঁফ ছাড়তে গিয়েহঠাৎ যেন বৃদ্ধ আরো অস্থির হয়ে উঠলো। কিছু যেন বলতে চায় সে।

''চোখের দৃষ্টি অপলক, বৃদ্ধ এইবার ডুকরে আর্তনাদ করে উঠল, সঙ্গে সঙ্গে চুরমার হয়ে গেল নীরবতার জগদ্দল। -কি দোষ করেছিল আমার ছেলে? ওরা কেন তাকে গুলি করে মারল? কি দোষ-কি দোষ করেছিল সে? কি দোষ করেছিল সে?*

ভাষা আন্দোলনের প্রাথমিক পর্যায়ে লিখিত এ গল্পটিতে মাতৃভাষার আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী যুবক ছাত্রের মৃত্যু, পুত্রহারা বৃদ্ধ পিতার নির্বাক অনুভূতি এবং সরকার কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থায় বাংলাভাষীদের আতঙ্কিত হয়ে যাওয়ার চিত্রই স্থান পেয়েছে। ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী ছাত্র - জনতার উপর পুলিশের গুলি, এই অভাবনীয় ব্যবস্থার পূর্ব বাংলার জনগণ বিস্মিত ও হতবাক হয়ে পড়েছিল। এ গল্পটির মধ্য দিয়ে একটি বিশেষ সময়কে তুলে ধরা হয়েছে। সে সময়ে ওসমান সাহেব চট্টগ্রামে থাকতেন। আর সুদূর চট্টগ্রামেও সেদিন ২১শে ফেব্রুয়ারির প্রভাব যে কিভাবে সম্প্রসারিত হয়েছিল এ গল্পটি তারই প্রমাণ। গল্পটি সম্পর্কে অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম সাহেব বলেছেন, /বায়ান্নোর একুশে ফেব্রুয়ারির ঘটনায় পূর্ব বাংলার প্রতিক্রিয়ার রূপক বলা যেতে পারে গল্পটিকে। বাহান্নোর একুশের ঘটনা ঘটেছিল ঢাকায় অথচ তার তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ার যেমন প্রথম সার্থক কবিতা রচিত হয়েছিল চট্টগ্রামে (মাহবুব-উল-আলম চৌধুরীর কাঁদতে আসিনি, ফাঁসির দাবি নিয়ে এসেছি) তেমনি প্রথম সার্থক গল্পও রচিত হয়েছিল চট্টগ্রামে, শওকত ওসমানের 'মৌন নয়'।*

এদেশের ছাত্রসমাজকে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন কতোটা নাড়া দিয়েছিল সাইয়িদ আতীকুল্লাহর 'হাসি' গল্প থেকেই তার পরিচয় পাওয়া যায়। এ গল্পের নায়ক আবু মাসীর বাসায় থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া করে। নীহার মাসী ও আবুকে অত্যধিক আদরস্নেহ করে। আবু দিন রাত ঘরে বসে শুধু পোস্টার আঁকে। একদিন মাসীর কাছে সব জানাজানি হলে মাসীও শেষপর্যন্ত আবুর সাথে রাষ্ট্রভাষার আন্দোলনে একাত্ম হয়ে যায়। মাসীকে জোর করে হাসাতে চায় বলেই আবুর ওপর মাসীর অভিমান হয়। এখানে স্বতঃস্ফূর্তভাবে মাতৃভাষায় নিজেকে প্রকাশ করার প্রতীক হিসেবেই হাসি ব্যবহৃত হয়েছে। রাষ্ট্রভাষার আন্দোলন, সরকারি ষড়যন্ত্র, ২১ তারিখের ডাক ইত্যাদি বিষয়ের অনেক পোস্টার আবু তৈরি করে তার ঘরে রেখেছে।

২১ তারিখ সকালে আবু মাসীর নিকট ছয়আনা পয়সা চায়। কারণ সাড়ে নয়টায় তাকে বিশ্ববিদ্যালয়ে পৌঁছাতে হবে এবংএগারটার মধ্যে সবগুলো পোস্টার সেঁটে শেষ করতে হবে। বারোটায় আবার মিটিং-এ যেতে হবে তাকে। মাসী ছয় আনার বদলে একটাকা দিয়ে কিছু খেয়ে নিতে বলে, চুয়াল্লিশ ধারা ভাঙার পরিণাম সম্পর্কে সাবধান করতে চাইলো, কিন্তু আবু ভয়ের তোয়াক্কা নাকরেই মাসীকে রাগিয়ে বেরিয়ে গেল। বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে অনেক পুলিশের সমাগমের মধ্যে চুয়াল্লিশ ধারা ভাঙার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলে একসময় ঠেলা-ঠেলি-মারামারি শুরু হয়। গুলি চালানো সত্ত্বেও এখান সেখান থেকে বিচ্ছিন্ন আওয়াজ ওঠে।

রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই।
নাজিম - নূরুলের ফাঁসি চাই।
খুনি জল্লাদের বিচার চাই, দমননীতি চলবে না।
শেষবারের মত গুলিবিদ্ধ একজনের কন্ঠনালী চিরে শ্লোগান ওঠে,
রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই।

অন্যদের সাথে সেদিন আবুও গুলি খেয়েছিল। আবুর মৃতদেহ রিকসায় করে কয়েকজন লোক বাসায় নিয়ে আসলে নীহার মাসী শোকে - দুঃখে বিহ্বল হয়ে যায়।

ছাত্র-জনতা-চাকুরে সবাইকে কতটা আলোড়িত, আন্দোলিত ও অনুপ্রাণিত করেছিল বাহান্নর ভাষা আন্দোলন তার একটা চিত্র পাওয়া যায় আনিসুজ্জামান সাহেবের 'দৃষ্টি' গল্পে। এ গল্পটিও হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত 'একুশে ফেব্রুয়ারী' সংকলেন প্রকাশিত হয়েছিল। সাদত সাহেব একজন পেনশনভোগী কেরানী। পেনশনের টাকাও ঠিকমতো পাওয়া যাচ্ছে না। পুত্র আসাদের টাকায় সংসার চলে কোনোরকমে। মেয়ে সালেহার বিয়ে দেওয়াও দরকার। এমনি দারিদ্র্যজর্জরিত সংসারের ক্ষীণদৃষ্টি বৃদ্ধের চশমাটিও এক ঝড়ের রাত্রে ভেঙ্গে যায়। সালেহা এক সময়ে দৌড়ে এসে পিতাকে জানাল যে, মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেলে ছাত্র রাষ্ট্রভাষারদাবীতে বিক্ষোভ করলে, পুলিশ প্রথমে লাঠিচার্য, কাঁদুনে গ্যাস নিক্ষেপ করেছিল এবং শেষ পর্যন্ত গুলিও করেছিল যাতে ছয় জন মারা গেছে। পুলিশের গুলি সম্পর্কে বৃদ্ধের ভাবনা শেষ হতে না হতে পুত্র আসাদ বাসায় ফেরে।

পরদিন সকালে সাদত সাহেব ঘুম থেকে উঠেই ছেলে আসাদের খোঁজ নিয়ে জানতে পারলেন যে শুক্রবার বিধায় সে একটুসকালেই অফিসে চলে গেছে। আজ আবার চারজনের বেশি একসাথে চলছে না। তাই পথঘাটও নিস্তব্ধ। মৃত্যুর কথা মনে পড়ছেবৃদ্ধের আজ। হঠাৎ এরই মাঝে শুনতে পেলেন বৃদ্ধা জীবনের মহা কঠিন সংবাদ। তারপর কান্না শুধুই কান্না। সাদত সাহেব যেন কিছুই দেখতে পাচ্ছেন না। চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে এলো তার। আশাদ নেই। এ গল্পে লেখক একুশে ও বাইশে ফেব্রুয়ারির ঘটনাকেই বেশ হৃদয়বিদারক ভাবে তুলে ধরেছেন। দারিদ্র্যজর্জরিত পরিবারের সন্তান ভাষা আন্দোলনে প্রাণ হারানোতে গোটা পরিবারটি কিভাবে আঘাতপ্রাপ্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত হলো গল্পকার স্বল্প পরিসরে তা চিত্রায়িত করেছেন। আর এপরিবারটিই যেন সারা বাংলাদেশেরই প্রতীক হয়ে উঠেছে।

মিন্নাত আলী'র 'রুম বদলের ইতিকথা' ভাষা আন্দোলন নিয়ে লেখা। গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ফজলুল হক মুসলিম হল বার্ষিকী ১৯৫৩-৫৪ সংখ্যায়। পরবর্তীতে গল্পটি তাঁর 'যাদুঘর' (১৯৬৯) গ্রন্থে সংকলিত হয়। উত্তম পুরুষে লেখা গল্পটির কথক বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র এবং হলে বাস করেন। সেদিন রাতে রেডিও অনুষ্ঠান শুনে রুমে ফেরার পথে এক কলেজ পড়ুয়া যুবকের সাক্ষাৎ পেলে যুবকটি তাকে জিজ্ঞাসা করে তিনি কি একশত তিন নম্বর রুমে থাকেন? এবং কথকের একশত তিন নম্বর কক্ষ নিশ্চিত হয়ে যুবকটি চলে যায়। পরদিন আবারো এলো যুবকটি। এবার সে প্রস্তাব দিলো যে, তার আম্মার অনুরোধ অনুযায়ী আজ বিকেলে কথক তাদের বাসায় যাবেন কিনা? জামিল নামের এই ছেলেটি বিকেলে এসে কথককে বাসায় নিয়ে গেল। কিছুদিন পর মাঝবয়সী এক ভদ্রমহিলা পর্দা সরিয়ে এসে ঘরে ঢুকলেন। সঙ্গে দশ বছরের মেয়ে নাজমা। কথাবার্তায় একপর্যায়ে জানা গেল মহিলার বড় ছেলে আনিস এম. এস. সি. পড়তো এবং একশত তিন নম্বর কক্ষেই থাকতো। রাজনীতি না করলেও সে মাতৃভাষা, সাহিত্য ও দেশের জন্য ভাষার মিছিলে যোগ দিয়েছিল। আলোচনার মাধ্যমে আনিস সম্পর্কে যা জানা গেল তা হল /ছাত্রদের মিছিল শহর প্রদক্ষিণ করে যখন সেক্রেটারিয়েট ভবনের দিকে অগ্রসর হয়ে থাকে, তখন পুলিশ বেপরোয়া গুলি চালায়। আর সে গুলিতে আনিস প্রাণ হারায় পরের দিন হাসপাতালে।*

জামিলদের বাসা থেকে ফিরে আসার পর কথক আর তার নিজ কক্ষে ঘুমুতে পারছেন না। হটাৎ একরাতে স্বপ্নের মাঝে কথক দেখছেন, সৈন্যরা সবাই আনিসকে তাড়িয়ে নিয়ে আসছে এবং তার দরজা ভেঙ্গে সবাই ঢুকতে চাচ্ছে। ঘুমের ঘোরে লাফ দিয়েউঠেই কথক দরজা খুলে দৌঁড়াতে লাগলে, পাশের রুমের ছাত্ররা তাকে ধরে ফেলে। তারপর থেকে কথক আক কিছুতেই একশত তিন নম্বর রুমে ঢুকতে চাইলেন না।

এ গল্পটিতে ভাষা আন্দোলন পরবর্তী সময়ের একটি প্রতিক্রিয়া তুলে ধরা হয়েছে। পাকিস্তানী শাসকদের হাতে মাতৃভাষারমর্যাদা দিতে গিয়ে আনিস নিহত হয়েছে। যা সাধারণ

ঘটনা নয়। এ গল্পে উপজীব্য করা হয়েছে সমগ্র জাতির চেতনা যে বিষয়কে কেন্দ্র করে একদিন জাগ্রত হয়েছিল সে বিষয়কেই। এ গল্পটিতে পাওয়া যায় রাষ্ট্রভাষার আন্দোলন সমসাময়িক ছাত্রসমাজ কিভাবে কতোটা সম্পৃক্ত হয়ে পড়েছিল তার প্রমাণ। আনিস বিজ্ঞানের ছাত্র হয়েও মাতৃভাষার প্রশ্নে তার বড় পরিচয় হলো সে একজন সচেতনছাত্র। বাহান্ন সালের পরবর্তী সময়েও ভাষা আন্দোলন এ দেশের মানুষের মনে কতো সজীব ছিল তা এগল্পেই আমরা দেখতে পাই।

পাকিস্তান সৃষ্টির পর সর্বপ্রথমে বাঙালিরা রাষ্ট্রভাষা নিয়ে নিজেদের অধিকার সম্পর্কে ভাবতে ও কথা বলতে শুরু করেছিল। সে সময়ে আমলা বা অন্যান্য পেশায় নিয়োজিত প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিবর্গ যারা অনেক আগে থেকেই নানা প্রকার সুবিধা ভোগ করে আসছিলেন, তারা কিন্তু প্রকাশ্যে সমালোচনা করতে পারেননি শাসনযন্ত্রের বিরুদ্ধে। তাছাড়াও এর মধ্যে এমন এক শ্রেণীর সুবিধাবাদী লোক ছিল যারা নিজেদের ভাগ্য ছাড়া অন্যকিছুই ভাবতে পারেননি। আরো একশ্রেণীর লোক ছিল যারা শাসক মহলের অনুগত থাকলেও নিজেদের স্ত্রী, সন্তান - সন্ততি, কিংবা পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের কারণে অনুরূপ অনুগত থাকতে পারেননি। যার ফলেকারো কারো চাকুরির উপরও যথেষ্ট চাপ তৈরী হয়েছিল। এমনই একটি চিত্র তুলে ধরা হয়েছে সরদার জয়েনউদ্দীনের 'খরস্রোত' নামক গল্পে।

খান বাহাদুর মীর্জা গোলাম হাফিজ অবসরপ্রাপ্ত এক সময়ের জাদরেল ডিস্ট্রি* ম্যাজিস্ট্রেট। তার এম. এ. পাশ করা ছেলে মুনির। সে সময়ের সিভিলিয়ান কর্মকর্তাদের মতো তিনিও চেয়েছিলেন ছেলে একটা বড় ধরনের সরকারী চাকুরি নিয়ে সুখে বাস করবেন। এমনকি তিনি ছেলের টি-বোর্ডের একটা চাকুরির জন্য মিনিস্টারের সাথে একটা এনগেজমেন্টও করে রেখেছিলেন। কিন্তু তাতে ছেলে মুনিরকে পাওয়া গেলনা বরং ছেলে গরীবদের আন্দোলন নিয়ে ব্যস্ত। আজ খান বাহাদুর সাহেব ছেলেকে বাইরে যেতে বারণ করলে ছেলে মুনির তা গ্রাহ্য করেনি। এমন কি মেয়ে ফরিদাও তা শোনেনি।

এক সময় ঘরে ফিরে আসে ছেলে মনির। প্রথমেই তাকে পিতার প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয়। বাইরে যাওয়া নিষেধ সত্ত্বেও কেন বাইরে যাওয়া হল? এর উত্তরে মনির জানায় দেশের প্রতি হাজার হাজার ছেলে-মেয়ের মতো তারও কিছু কর্তব্য আছে। সিংহের মতো গর্জন করলেন বটে খান বাহাদুর কিন্তু নিজে নিজেই স্তব্ধ হয়ে গেলেন। মুনিরকে পুলিশ এসে গ্রেফতার করে নিয়ে যায়। অন্যান্য ছেলেরা এসে পরদিন মুনিরকে মিছিলে নিয়ে যেতে চায়। ছেলেদের খান সাহেব জানায় মুনিরকে কাল পুলিশে ধরে নিয়ে গেছে। তাই তিনি জানতে চাইলেন মুনিরের বদলে তার গেলে চলবে কিনা? বাংলার ছেলেদের সঙ্গে এক হয়ে গেলেন শেষ পর্যন্ত খান বাহাদুরও। আর আমাদের সাহিত্যিকরা এভাবেই বাংলা সাহিত্যে ভাষা আন্দোলনের স্মৃতিকে প্রতীকের মাধ্যমে রূপায়িত করেছেন। যা পরিস্থিতির বাস্তবতায় জাঁদরেল আমলাকেও সরকারের বিপক্ষে গিয়ে ভাষা আন্দোলনে জড়িত পুত্র কন্যার সাথে সম্পৃক্ত হতে হচ্ছে। এ গল্পটিতে তারই ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে।

উনিশ শ' বাহান্ন সালের একুশে ফেব্রুয়ারির ঘটনাকে কেন্দ্র করে নূরউল আলম সাহেব ১৯৫৭ সালে 'পুতুলের কান্না' গ্রন্থের 'একালের রূপকথা' গল্পটি রচনা করেন। উচ্চপদস্থ মোটা মাইনের একজন সরকারী কর্মচারী হামিদ সাহেব। বাইশ বছর বয়সেরছেলে কাসেম একুশে ফেব্রুয়ারি ভোরে বাসার বাইরে যাবে এটা আলম সাহেব মানতে পারছেন না। কাসেম পিতার নিষেধ বাক্য অগ্রাহ্য করে শান্ত, দৃঢ় কণ্ঠে পিতাকে জানিয়ে দিল বাধা না দেয়ার জন্য এবং এতো পড়াশোনা করে সে কাপুরুষ সেজে ঘরে বসে থাকতে পারবে না। অন্যথায় নিজের বিবেকের কাছে নিজেকে জবাদিহি করতে হবে। এ বলে কাসেম ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। অপরদিকে অভিমান সহকারে অফিসের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে যান হামিদ সাহেব, ছেলের বিবেক হয়েছে, পিতার কথা অগ্রাহ্য করে, নিজের মর্জিমাফিক রাজনীতি করতে ইত্যাদি কথা ভাবতে ভাবতে।

রাস্তায় যেতে হামিদ সহেব লক্ষ্য করেন সশস্ত্র পুলিশ, প্রিজনার্স ভ্যান, শ্লোগান) 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' শহীদ স্মৃতি আমর হোক' ইত্যাদি। ছেলের অমঙ্গল চিন্তা করে তার উপর অভিমান করলেন তার অবাধ্যকতার কথা ভেবে। দুপুরে বাসায় কড়া নেড়েউঠলে দরজা খুলে মা দেখলে দুটি ছেলে কাসেমকে ধরাধরি করে দাঁড়িয়ে আছে। মাথায় ব্যাণ্ডেজ, পাঞ্জাবি রক্তে লাল হয়ে গেছে।ছেলের এহেন অবস্থা দেখে মায়ের মূর্চ্ছিত হবার উপক্রম। তখন ছেলে দুটি কাসেমকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে বলল ভয়ের কারণ নেই, আঘাত গুরুতর নয়। দুদিনেই সেরে যাবে। এই ছোট গল্পে রূপায়িত একুশ সম্পর্কিত ঘটনা আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম সমূহের সামনেএভাবেই তুলে ধরা সম্ভব বলে মনে হয়।

মঈদ-উব-রহমানের ১৯৫৮ সালে প্রকাশিত 'ময়ূরের পা' গ্রন্থের 'সিঁড়ি' গল্পের বৃদ্ধ করিম সাহেব ঢাকা যাবেন সকালের নৌকায়। ভাষা আন্দোলনের কর্মী তার ছেলে সিরাজ। ঢাকা জেলে বন্দি মুক্তি পাবার কথা আজ তার। শ্বশুর গরম ভাত খেয়ে যাত্রা করুক চায় বউমা। তাই ভাত হবার আর কত দেরি? জিজ্ঞাসা করেন করিম সাহেব। ধূম্রাচ্ছন্ন উনোনে ফুঁদানরতা বউমার চেষ্টায় শেষ নেই।

সিরাজ বি.এ. পরীক্ষা দিয়ে মরিয়মদের বাড়িতে বেড়াতে এলে প্রথমে মরিয়মের সাথে ভালোবাসা হয় এবং তাদের দুজনের পরিবারের সম্মতিতে বিয়েও হয়। দেশের বুকের উপর দিয়ে ১৯৫২ সালে যে ঝড় তুফান বয়ে গিয়েছিল তাতে তরুণ, বৃদ্ধ, ছাত্র-কেরাণী সকলেই রাষ্ট্রভাষার জন্য আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। আর সেই তুফানের তরঙ্গে সিরাজও ভেসে গেল। শত চেষ্টা করেও মরিয়ম তাকে ফিরাতে পারেননি। প্রতি রবিবারেই সিরাজ বাড়ি আসে। কিন্তু এক রবিবারের আগেই ঢাকা থেকে খবর এলোধ্বংসাত্মক কাজে জড়িত থাকার কারণে সিরাজকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে। দু বছরেরও বেশি সময় পর সিরাজের মুক্তি পাবার কথাআজ। দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়েও সন্ধ্যা পেরিয়ে রাত এলো সিরাজের অপেক্ষায় মরিয়ম বসে আছে। বৃদ্ধ শ্বশুর করিম সাহেব অবসন্ন দেহে একা ফিরে এলেন কিন্তু আসতে পারেনি সিরাজ। কারণ মুক্তি পেয়ে সিরাজ পিতার সাথে রওনা হলে পুলিশ এসে জননিরাপত্তা আইনে আবার তাকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায়।

এতেও মরিয়ম ভেঙ্গে না পড়ে আশায় বুক বেঁধে শ্বশুরকে সাহস জোগালো। আর এই সাহসই হলো মাতৃভাষাকে লাভ করা সাহস। যা আমাদের জাতীয় জীবনে আলোড়ন সৃষ্টিকারী একটি ঘটনা হল ভাষা আন্দোলন। এই ভাষা আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্তঘটনাবলীই আমাদের ছোটগল্পে স্থান পেয়েছে নানাভাবে।

মাতৃভাষা বাংলার পরিবর্তে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা ঘোষণা করা মাত্রই বাংলার ছাত্র-জনতা প্রতিবাদমুখর হয়ে ওঠে। বিভিন্ন দৃষ্টিকোন থেকেও আমাদের গল্পকাররা ভাষা আন্দোলনকে তুলে ধরেছেন নানাভাবে। লেখিকা রাবেয়া খাতুনও বাহান্নর ভাষা আন্দোলনের একটা স্পষ্ট ছবি তুলে ধরেছেন তার 'প্রথম বধ্যভূমি' গল্পে। একজন সাধারণ স্কুল শিক্ষক সাবের সাহেব। ছেলে শাহেদ সকালবেলা কলেজের নাম করে বেরিয়েছে। বেলাও অনেক হয়েছে কিন্তু এখনো ফিরছে না দেখে সবাই চিন্তিত। রাষ্ট্রভাষার দাবিতে মিছিলচলছে বাইরে। মা সকালে ঘরের বাইরে যেতে বারণ করলেও শাহেদ গিয়েছে। পিতার ভয় না জানিয়ে পুত্রের কারণে তার স্কুল শিক্ষকতার চাকুরিটাই চলে যায়

রাস্তায় মিছিল আর আগুন। এরই মধ্যে পুত্রের খোঁজে বেরিয়ে পড়েন দুশ্চিন্তাগ্রস্ত পিতা। গলির মুখেই শাহেদের বন্ধুদের কাছে জানতে পারে পুলিশের গুলিতে শাহেদ মারা গেছে। পুলিশ তার লাভ নিয়ে গেছে। তারপরের ঘটনা দ্রুত এগিয়ে যায়। যে জায়গাটায় ছাত্রদের গুলি করে মারা হয়েছিল মেডিক্যাল কলেজ সংলগ্ন, সাবের সাহেব সে বধ্যভূমিটাতে এসে দেখেন যে, একটি শহীদমিনার নির্মাণ করছে সেখানে ছাত্ররা। রাজপথের রক্ত আর আন্দোলনকে অস্বীকার করে পুলিশ লাশ গুম করতে চাইলেও ছাত্ররা তাহতে না দিয়ে এই প্রথম বধ্যভূমিতে - শহীদ মিনার নির্মাণ করছে।

একুশের স্মৃতিকে অম্লান করে রাখার জন্য আমাদের বাংলা সাহিত্যে যে কজন সাহিত্যিক কলম ধরেছিলেন, জাহির রায়হান তাদের মধ্যে অন্যতম। ভাষা আন্দোলনে আত্মদানকারী একজন সংগ্রামী যুবককে নিয়েই তাঁর 'একুশের গল্প' লেখা হয়েছে। প্রথম পাকিস্তানি বৈষম্যমূল্য শাসনের বিরুদ্ধে বাঙালিরা ভাষাকে কেন্দ্র করে সোচ্চার হয়ে ওঠে একুশে ফেব্রুয়ারির আন্দোলনে। সেদিন সচেতন বাঙালি ছাত্র-জনতা একাত্ম হয়ে মাতৃভাষাকে স্বমর্যদায় প্রতিষ্ঠিত করার জন্য পাকিস্তানি ষড়যন্ত্রমূলক শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছিল। বাহান্নর ভাষা আন্দোলনে ছাত্র সমাজের ভূমিকা ছিল সবচেয়ে উজ্জ্বল।

এ গল্পের নায়ক তপু মেডিক্যোল কলেজের ছাত্র। অন্য বন্ধুদের চেয়ে বয়সে ছোট হলেও তপু ছিল বিবাহিত। তপুর বাঁ পায়ের হাঁড় সামান্য ছোট হওয়ার কারণে সে একটু খুঁড়িয়ে হাঁটতো। হোস্টেলের বাইরে একদিন প্রচুর লোকের সমাবেশ দেখা গেল। কারো হাতে প্ল্যাকার্ড, কারো হাতে শ্লোগান দেবার চোঙ্গা, কারো হাতে লম্বা লাঠিতে ঝুলানো রক্তাক্ত জামা। সেই মুহূর্তে তপুও এগিয়ে চললো মিছিলের দিকে। রেণু সে সময় এসে তপুর হাত ধরে বললো, বাড়ীতে মা কাঁদছেন, কিন্তু শেষপর্যন্ত স্ত্রীর কাছ থেকে হাতটা ছাড়িয়ে মিছিলে মিশে গেল। তারপর মিছিলে পুলিশের গুলি তপুর কপালের মাঝখানটায় লেগে লুটিয়ে পড়েই মারা যায়। সেদিন ঘটনাস্থল থেকেই সরকারি কর্তৃপক্ষ তপুর লাশ সরিয়ে নিয়ে যায়। হোস্টেলে তপুর সিটটা কিছুদিন খালি পড়েছিল। চার বছর পর একদিন নতুন রুমমেট বিছানায় বসে এনাটমির পাতা উল্টাচ্ছিল এবং স্কালের সাথে মিলিয়ে পড়তে গিয়ে দেখতে পেলো স্কালটার কপালের মাঝখানে একটি গর্ত। রাহাত কথাটা শুনামাত্রই স্কালটা তুলে নিয়ে দেখতে লাগল এবং ঝুড়ি থেকে হাড়গুলো নিয়ে দেখতে পেল বাঁ পায়ের হাড় ২ ইঞ্চি ছোট। রাহাত সঙ্গে সঙ্গে স্কালটা দুহাতে তুলে ধরে বলে উঠলো 'তপু'।

রায়হান সাহেব গল্পটির সমাপ্তি যেভাবে দান করেছেন তাতে অতিনাটকীয়তা রয়েছে। গল্পের আঙ্গিক, শিল্পগুণ বিষয়ে আলোচনা না করেও গল্পটিকে ভাষা আন্দোলনের একটি

ছাত্রসমাজকে কতোটা নাড়া দিয়েছিলো ছাত্রদের ত্যাগ স্বীকারের প্রস্তুতি কতটাবলিষ্ঠ ছিল মাতৃভাষাকে স্বর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে। স্ত্রীর বাধা প্রত্যাখ্যান করে মাতৃভাষার টানেই তপু মিছিলে যোগ দেয়ে এবং শেষ পর্যন্ত চিরদিনের জন্যে পৃথিবী থেকে হারিয়ে যায়। আর এ মাতৃভাষার প্রতি আন্তরিক আকর্ষণেই ভাষা শহীদরা পিতা-মাতা, স্ত্রী-পুত্র কন্যা ও আপনজনদের কাঁদিয়ে, তাদের বুক শূন্য করে শহীদ হয়েছিল। এ গল্পে ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে বাহান্নর উত্তাল দিনগুলো এবং সে সময়কার বাংলাভাষীদের সাধারণ প্রতিক্রিয়া মানবিক রসে সঞ্জীবিত হয়েছে। বাংলা ছোটগল্পে ভাষা আন্দোলনেরপ্রকাশ সম্পর্কে বশীর আলহেলাল বলেছেন ঃ ''অনেকে বলেন, ভাষা আন্দোলন আমাদের সাহিত্যে যে প্রভাব ফেলবে বলে মনেকরা হয়েছিল তা পড়েনি। ১৯৫২-র পরে অবশ্যই কিছু সাড়া জেগেছিল। কিন্তু প্রাণের সেই জোয়ার আমাদের সাহিত্যের দু-কুলকে প্লাবিত করার আগেই তাতে ভাটা পড়েছিল। কথাটা হয়তো মিথ্যা নয়। এবং সেটা আমাদের ভয়ংকর দুর্ভাগ্যের কথা। কিন্তু তবু সেই ১৯৫২-ই হচ্ছে ল্যাণ্ডমার্ক। আমাদের সাফল্যের জয়যাত্রা ওখান থেকেই শুরু হয়েছিল।

বাঙালিদের জন্য একটি দিক নির্দেশনামূলক ঘটনা হল ভাষা আন্দোলন। এই আন্দোলনের মধ্য দিয়েই পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ নিজেদেরকে বাঙালি হিসেবে ভাবার সুনির্দিষ্ট যৌক্তিকতা খুঁজে পায়। কারণ, মাতৃভাষার ওপর আঘাত আসার পরই বাঙালি জনগণের কাছে অখণ্ড পাকিস্তানের প্রয়োজনীয়তা ধারাবাহিকভাবে ফুরিয়ে আসতে থাকে। 'কয়েকটি সংলাপ' গল্পে জহির রায়হান সাহেব ভাষা আন্দোলনকে অতি অল্প পরিসরে আলোচিত সময় ও সমাজকে তুলে ধরেছেন। ১৯৭১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে এ গল্পটি লেকা হয়। এতে একুশকে নিয়ে ভাবনা আছে। নতুন উপলব্ধিতে তাকে বিশ্লেষণ করার ইঙ্গিত আছে। ১৯৭১ সালে লেখা হলেও এই গল্পের মাঝে ভাষা আন্দোলনকে স্পষ্টরেখায় উদ্ভাসিত করে তোলা হয়েছে।

বাঙালিমাত্রই সত্যিকার আলোড়িত হয়েছিল বাহান্নার ভাষা আন্দোলনে। এই ভাষা আন্দোলনের আবেগ ও মানসিকতা উপজীব্য করেই অনেক বাংলাভাষী লেখক সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন। আর এ সকল সাহিত্যকর্ম ভাষা আন্দোলনের প্রভাব ও ব্যাপ্তি আমাদের জীবনে কতোটা প্রসারিত হয়েছিল তার একটা পরিচয় লাভ করা যায়। 'উৎস থেকে নিরন্তর' গ্রন্থের 'দীপাম্পিতা' গল্পে সেলিনা হোসেন ভাষা আন্দোলনের একটি সুনির্দিষ্ট চিত্র তুলে ধরেছেন। কর্তব্যপরায়ণতার জন্য তিন তিনবার পুরস্কার প্রাপ্ত পুলিশ বিভাগের কর্মচারী সাদৎ আলী। ভাষা আন্দোলনের সাথে জড়িত থাকার ফলে পুত্র সবিন এর জন্য তিনি চিন্তিত। স্ত্রী আমিনাও বেশ উদ্বিগ্ন পুত্রের জন্যে। আগামী কাল কি হবে এ নিয়েই উভয়ের ভাবনা। পরদিন স্বামীকে অফিসে না যেতে প্রস্তাব দেয় আমিনা খাতুন। উত্তরে সাদৎ আলী জানায়, 'কর্তব্য তার কাছে জীবনের চেয়ে বড়'। সঙ্গে সঙ্গেই আমিনা খাতুন স্বামীকে আঘাত করে বলে আরেকটা প্রাইজ নেবার লোভ হয়েছে। একথা শুনে সাদৎ আলীর মনে হচ্ছে গত পনেরো বছরের পুলিশের চাকুরি মনের দিক থেকে তাকে দেউলে করে দিয়েছে। রাত বাড়ছে। একসময় সাদৎ আলী ছেলের ঘরে এসে দেখতে পান সবিন এখনো ঘরে ফিরে নাই। আর তার চৌকির নিচে লেখা রয়েছে বিরাট-বিরাট পোস্টার। সাদৎ আলী একটা খুলে দেখেন লেখা আছে)'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই'। রাত আরো গভীর হলে সাদৎ আলী এক সময়ে ঘুমিয়ে পড়ে।

পরদিন সকালে সাদৎ আলী সবিনের ঘরে গিয়ে দেখতে পান দরজাটা খোলা। বিছানা এলোমেলো; আমিনা খাতুন দাঁড়িয়ে আছেন। সবিন আমিনা খাতুনের পেটের সন্তান না হয়েও সবিনই তাকে প্রথমে মা বলে ডেকেছিল। সেই মা ডাকের সাথে জড়িত ভাষার জন্যেই সবিন সংগ্রামে নেমেছে তাই তিনি অনেকটা মানসিক ভারাক্রান্ত। বিশ্ববিদ্যালয়ের গেটে ডিউটির জন্য সাদৎ আলী তৈরী হয়ে আছে। ভেতরে শ্লোগানের পর শ্লোগান চলছে। কর্তব্য সচেতন সাদৎ আলী আজ নিজেকে অনেক দুর্বল মনে করছে। আরভাবছে কাদের মারবে সে? সাবিন, আমিনা খাতুন ও অন্যান্য ছেলেদের - মেয়েদের মুখ মনে পড়ছে তার। আজ কিছু একটা হয়েছে সাদৎ আলীর, কারণ যে কর্তব্যকে প্রাণের চেয়েও ভালোবাসে আজ তার কিসের এতো দ্বন্দ্ব? যা স্ত্রী-পুত্র ও মাতৃভাষার পক্ষে যোগদানের তৃপ্তি তার মন থেকে সকল ভীতি দূর করে দেয়। এ গল্প থেকে উপলব্ধি করা যায় মাতৃভাষার আন্দোলন বাংলাদেশে বাঙালিদের কতটা আলোড়িত করেছিল। ভাষা আন্দোলনের দেড় যুগ পরে প্রকাশিত হলে বোঝা যায় ভাষা আন্দোলন পরবর্তীকালেও সাহিত্যিকদের কতোটা প্রভাবিত করেছিল। আর এ গল্প সম্পর্কে মুহম্মদ আবদুল হাফিজ 'পূর্বমেঘ' পত্রিকায় লিখেছেন যে, /কর্তব্যপরায়ণ পুলিশ অফিসার বন্দুক উঁচিয়েও মিছিলে গুলি চালাতে পারেনি, কারণ তার নিজের ছেলেও রয়েছে মিছিলে। নিজের ছেলের মধ্যেপুলিশ অফিসারটি দেখেছিলেন দেশের সমস্ত ছেলেকে - তাই তার বন্দুক গর্জন করেও মাথা নুইয়ে দিয়েছে মাতৃভাষার প্রতি সম্মানে।*

পূর্ব - পাকিস্তানি বাঙালিরা ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমেই সর্বপ্রথম নিজেদের সমস্যা নিয়ে নিজেদের মতো করে সাহিত্য রচনার সূচনা করে। পূর্বে যে সামান্য সাহিত্যকর্ম সৃজিত হয়েছিল তাতে পাকিস্তানের গুন - গান ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গারই প্রতিফলন। পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিরা সর্বপ্রথম নাড়া খেয়েছিল ভাষার প্রশ্নেই। এ আন্দোলন সম্পর্কে কয়েকজন সমালোচক বলেছেন ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারিতে ঢাকায় ছাত্রদের উপর গুলিবর্ষণের মধ্য দিয়েই বাংলাভাষীদের প্রতি পাকিস্তানিদের মনোভাব খুবই স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়ে পড়ে এবং পাকিস্তান রাষ্ট্রের ভাঙন অনিবার্যভাবে হয়ে ওঠে। আর এ সম্পর্কে অধ্যাপক রফিকুল ইসলমান লিখেছেন যে, /একুশের হত্যাকাণ্ডের আকস্মিকতায় মানুষ শুধু শোকাহত নয় বরং বজ্রাহত ও স্তম্ভিত হয়েছিল, দ্বি-জাতিতত্ত্বের ভিত্তিতেসৃষ্ট পাকিস্তানে আঙালীদের স্বপ্নভঙ্গ ঘটে বাহান্নোর একুশে ফেব্রুয়ারীতে। যে রাষ্ট্রে তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ সেখানে তাদের মাতৃভাষার স্থান হবে না, তাদের ভাষা পরিবর্থন করতে হবে এমন ধারণা তাদের কেবল বিস্মিত ও বিমূঢ় করেনি সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ করেছিল। বস্তুতঃ দ্বি-জাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে উপমহাদেশের পূর্ভ ও পশ্চিমের মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল নিয়ে গঠিত ইসলামী রাষ্ট্র পাকিস্তান ভেঙে গিয়েছিল ১৯৫২ সালে ২১শে ফেব্রুয়ারী অপরাহ্নে মেডিকেল কলেজ মোড়ে যখন বাংলা ভাষার দাবীতে প্রথম বাঙালীর রক্ত ঝরেছিল।*

মাতৃভাষা ও স্ত্রীয় পুত্রের সাথে আপামর ছাত্রের মুখচ্ছবি কল্পনা করে ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী ছাত্রের পিতা পুলিশ বিভাগের কর্তব্যপরায়ণ কর্মচারী হয়েও শেষপর্যন্ত চাকুরি ছাড়ার জন্যেও মানসিক প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে। সে সময়ে পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন প্রদেশের জনসাধারণ রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে ততোটা সচেতন ছিলো না; তদুপরি ধর্মভিত্তিক রাজনীতির ধূম্রজালে পড়ে ভাষার প্রশ্নে কোনো উল্লেখযোগ্য আন্দোলন করেনি। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিরা যথেষ্ট পরিমানে রাজনীতিক সচেতন ছিলেন সে সময়ে। এখানে উল্লেখ করা যায় যে তৎকালীন ভারত ভাগের সময়ে সমগ্র ভারতবর্ষে একমাত্র পূর্ব পাকিস্তানেই মুসলিম লীগের সবচেয়ে বেশি আধিপত্য ছিল এবং স্বাধীনতা অর্জনে পূর্ব বাংলার ভূমিকাই সেদিন মুখ্য ছিল। কিন্তু স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নে বাঙালিদের কাছে পাকিস্তানের অসৎ উদ্দেশ্যে উন্মোচিত হয়ে পড়ে এবং রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিকভাবে বাঙালিরা এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, প্রতিরোধ ও সংগ্রামের পথ বেছে নেয়। ফলে বাঙালিদের প্রতি পাকিস্তানিদের মনোভাব আরো নগ্নভাবে ধরা পড়ে ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারীতে ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী ছাত্র - জনতার উপর পুলিশ বাহিনীর নির্বিচারে গুলি বর্ষণ।

আমাদের সাহিত্য ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে আরো সমৃদ্ধ হতে পারতো। কিন্তু, কবিতা যে পরিমাণে রচিত হয়েছে উপন্যাস, ছোটোগল্প ও নাটক সে পরিমাণে রচিত হয়নি। এমনকি গল্প সাহিত্যের ধারাটিও তেমন বিকশিত হয়নি। এর মূল কারণ হলো ভাষা আন্দোলনের পরে মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত আমাদের জাতীয় জীবনে স্থিতিশীল সময় বিশেষ একটা ছিল না। আর এই অস্থিরতার কারণেই হয়তো অধিক সংখ্যক উৎকৃষ্ট সাহিত্য কর্ম সৃজন করা সম্ভবপর হয়নি। ফলে এ পর্যন্ত যে কয়টি গল্প বিশ্লেষণ করা হলো তারথেকে ভাষা আন্দোলনের গুরুত্ব ও জাতীয় জীবনে এর প্রভাব কতটুকু সুদূরপ্রসারী তা আমরা অনুধাবন করতে পারি। তাই সংখ্যায় কম হলেও ভাষা আন্দোলনভিত্তিক ছোট গল্পগুলো আমাদের সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ঐতিহ্যের ধারক হিসাবে চিহ্নিত হতে পারে।